ডানাকাটা পরী

যুথিকা বড়ুয়া

(তিন)

পলিটিক্যাল্ পার্টির বিশিষ্ট নেতা ধীরেন মুখুজ্জ্যের একমাত্র তনয়ার বিয়ে, চাট্টিখানি কথা! অসীম আনন্দ নির্মলার। এতো আনন্দ কোথায় যে ধারণ করে রাখবে, কূল খুঁজে পায় না। বিয়ের দিন সকাল থেকেই আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব সবাই মেতে উঠেছে আনন্দে। ইউরোপীয় ষ্টাইলে বাদ্য বাজজে, সানাই বাজজে। বড়দের ভাগ-দৌড়, জল্পনা-কল্পনা, ছোটদের হৈ-হুল্লোড়, হাসি-কলোতান, গুঞ্জরণ, ছোটাছুটি, হাঁকাহাঁকি। সারাবাড়ি গমগম করছে। দূপুর থেকেই গোধূলীর শুভক্ষণের অপেক্ষায় বাড়ির সবাই অস্থীর হয়ে ওঠে। সন্ধ্যে থেকেই আগুন্তক অথিতি ও শহরের গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গের আপ্যায়ন শুরু হয়ে গিয়েছে। কনেপক্ষরাও ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে। অথচ এতো আনন্দ-উল্লাসের মাঝেও এতবড় একটা অহেতুক সংকট লুকিয়ে ছিল, তা বিয়ের পিঁড়িতে পাশাপাশি বর-কনের মুখদর্শণ করেও কারো নজরে পড়েনি। কিন্তু শুভদৃষ্টির শুভমুহূর্তে হৃদয়ের দুকূল প্লাবিত করে অব্যক্ত আনন্দের ঢেউ উতরে উঠতেই হঠাৎ অজানা আশঙ্খায় বুকটা ধুক্ করে ওঠে নববধূ নির্মলার। অস্ফূট আর্তনাদে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো চোখের তারাদু'টি ওর স্থির হয়ে গেল। -'এ কি, মেয়েদের মতো মাথাটা ঝুঁকে আছে কেন বিপ্লবের? আশ্চর্য্য! সদা হাস্যৎজ্জ্বল হ্যান্ডসাম মিশ্রব্যক্তিত্ব তরুণ যুবক, এমন শান্ত, সৌম্য লাজুক হয় কি করে? সেদিন ওকে দেখে একবারও তো এমন মনে হয়নি! নাঃ, এ তো বিপ্লব নয়! তা'হলে ও' কে?

উদ্ভ্রান্ত চোখে তাকিয়ে থাকে নির্মলা। চাপা উত্তেজনায় হৃদস্পন্দন ওর দ্রুতগতীতে চলতে শুরু করে। ক্রমাণ্বয়ে কম্পিত হতে থাকে ওর বুক। একটা শব্দও উচ্চারিত হয়না। আচমকা অনাকাঙ্ক্ষিত বিভীষিকায় সারাশরীর জমে হীম হয়ে যায়। অথচ একই চেহারা! কোথাও এতটুকুও তফাৎ নেই! সেই চোখ, নাক! সেই চিবুক! সেই পশমাবৃত বলিষ্ঠ বাহু! কিন্তু একটা মানুষ দু'দিনে এতখানি পরিবর্তন হয় কি করে? এ কেমন করে সম্ভব? আবার পরক্ষণেই ভাবল, এ প্রজন্মের তরুণ যুবক, সাদা ধবধবে আর্দী কাপড়ের ধূতী, শীল্কের কূর্তা পরিধানে বর বেশে বোধহয় লজ্জা পাচ্ছে!
তবু মনের ভিতর কোনো আশঙ্কা কিংবা সন্দেহের বীজ তেমনভাবে গজিয়ে না উঠলেও একরকম ঔদাসীন্যতা আর গহীন ভাবনার মধ্যে দিয়েই মিলন মন্ত্র উচ্চারণে সেদিন শুভপরিণয় সুসম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল নির্মলার। তারপর এলো বাসররাত। জীবনের পরম আনন্দের দিন। নতুন অভিজ্ঞতা। মনের মতো জীবনসাথী পেয়ে নির্মলার জীবন আজ ধন্য। সার্থক ওর জনম। আসন্ন বাসররাতের গভীর নির্জনতায় ও নিঃভৃতে আকাঙ্ক্ষিত কামনা-বাসনাগুলি যখন বাস্তবে চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে পৌছাবে, উফ্, তখন কি যে হবে!

পুলকে একটা শিহরণ খেলে গেল ওর দেহে এবং মনে। শ্বাশত লজ্জায় রাঙা বৌ নির্মলার বিবাহবাসরের চিরাচরিত জৌলুস ও সানাইয়ের মনমাতানো রাগিনীর অপূর্ব মূর্ছণায় ভিতরে ভিতরে মনকে আরো প্রভাবিত করলো। বাসরঘরের ঝুলন্ত ঝাঁড়বাতিটার ঝিকিমিকি আলোয় আর রজনীগন্ধার মধুর সুরভীতে সৃষ্টি হয় এক রোমাঞ্চকর পরিবেশ। ওর স্বপ্নের সেই স্বর্গপুরি। যেখানে ওরা দুজনই একমাত্র বাসিন্দা।
দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুলশয্যায় বসে আকাশকুসুম ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে নির্মলার। এ কি, নুতন চন্দন পালঙ্ক, বিছানাপত্র তোষক সবই নতুন! এর ভিতর থেকেই টপ্ করে একটা কাগজের টুকরো পড়লো নিচে। কাগজটা এলো কোত্থেকে? কিসের কাগজ?

মনের ভিতর নানান প্রশ্নের ভীড় জমে উঠতেই খানিকটা আঁতঙ্কিত হয়ে কাগজটা তৎক্ষণাৎ দ্রুত তুলে নেয় নির্মলা। আর খুলে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই ওর হৃদয়পটভূমির লালিত ও পূঞ্জীভূত সমস্ত কামনা-বাসনা, ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার ইচ্ছানুভূতিগুলি সব অনুতাপের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল নির্মলার।

একেই বলে বরাত। আসন্ন বাসররাতের ক্ষণপূর্বের কাগজের ঐ টুকরোটাই অভিশাপ হয়ে দেখা দিলো নির্মলার জীবনে। এ কেমন ভাগ্যের নির্মম পরিহাস? এ কেমন বিধাতা প্রদত্ত দু'টি মানব-মানবীর আত্মার মধুর মিলন? তাদের সংসার বেঁধে দেওয়ার মিথ্যে প্রয়াস? যেদিন মনের শক্তি, সাহস ও বুদ্ধি জোগাবার মতোও কেউ ছিল না নির্মলার পাশে।

কাগজটাতে লেখা ছিল,-'তোমায় কি বলে সম্বোধন করবো, জানি না। ক্ষমা করবে না জেনেও না লিখে পারলাম না। নইলে যে বড় অধর্ম হবে গো! চেয়েছিলাম, অন্ধগলির দুর্বিসহ জীবন থেকে বেরিয়ে এসে সুন্দর একটা ঘর বাঁধবো। একান্তে সুখে-শান্তি তে সংসার ধর্ম পালন করবো। তোমায় দেখার পর সেই ইচ্ছা আরো প্রবল হয়ে উঠল! জানো, রাতে আমার ঘুম হতো না! শুধুই ভাবতাম, নিবিড় করে, একান্ত আপন করে, কবে তোমায় কাছে পাবো। তোমায় নিয়ে আনন্দে দিন কাটাবো। তোমায় বুকভরে ভালোবাসবো, আদর করবো। যে কথার আজ আর কোনও মূল্য নেই! এসব তোমার কাছে অবাঞ্ছিতই মনে হবে। তুমি বিশ্বাস করো, অনেক চেষ্টা করেছিলাম, সাধারণ মানুষের মতো সভ্যসমাজে স্বসম্মানে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে, নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত করতে। কিন্তু পারলাম না। আজ আমি দুষ্টচক্রের শিকার। এমন সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েছি, ক্ষুধার্ত হায়নার মতো ঐ শয়তানগুলোর সঙ্গ বর্জন করা আজ আমার পক্ষে আর সম্ভব হলো না। আমার জন্মদাতা মাতা-পিতার মুখেও কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে তাদের উঁচু মাথা হেট করে, বংশের কুলাঙ্গার হয়ে আমায় পূনরায় ফিরে যেতে হ'ল, নরকের সেই আড্ডাখানায়। জীবনের রসাতলে। যেখান থেকে কোনদিনও আমার মুক্তি নেই। যদি পারো, আমায় ক্ষমা কোরো। এ তো মহান স্রষ্টার অসীম দয়া! এজন্যই বুঝি একই চেহারা নিয়ে একই মায়ের সন্তান হয়ে আমরা দুইভাই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে ছিলাম। যাকে বিবাহ করলে, ও' আমারই যমজ ভ্রাতা, সৌরভ। তুমি সত্যিই ভাগ্যবতী নির্মলা! ভাই আমার হীরের টুকরো ছেলে। বাবা-মায়ের সুযোগ্য পুত্র। শুধু চেহারায় হুবহু মিল। এছাড়া আমরা দু'জন সম্পূর্ণ আলাদা, ভিন্ন রুচী, ভিন্ন মনোবৃত্তি। জানো, ভাই আমায় ঘেন্না করে, অশ্রদ্ধা করে। তাই তো অভিমান করে দেশান্তর হয়েছিল। আজ ওর আর আমার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। সদ্য বিলেত ফেরত চ্যাটার একাউন্টটেন্ড্। নিজের ভাই বলে বলছি না, সৌরভ খুউব অনেষ্ট, ইনোসেন্ট পার্সন, এ্যান্ড হ্যান্ডসাম্, গুড্ লুকিং। শুধু ব্যবহারেই নয়, অত্যন্ত ভদ্র, নম্র, চিন্তাশীল, রুচীশীল একজন মার্জিত পুরুষ। সেন্ট্রাল গর্ভনমেন্টের নতুন একটা চাকুরীতে সদ্য জয়েন করেছে। ভাইকে সুখী করতে পারলে, জেনো আমিও খুশী হবো। আর্শীবাদ করি, ভাইকে নিয়ে সুখী হও! রাজরানী হও!'

নিচে ছোট্ট করে লেখা ছিল, হতভাগ্য বিপ্লব।

চিঠিখানা পড়তে পড়তে হৃদয়পটভূমি তুমুল কম্পনে তোলপার করে দিলো নির্মলার। থর্থর্ করে ওর গা কাঁপে, ঠোঁট কাঁপে। ঘর্মসিক্ত হয়ে ওঠে ওর সারাশরীর। রুদ্ধ হয়ে যায় কণ্ঠস্বর। এসব কি ঘটলো ওর জীবনে! স্বপ্নেও তো কোনদিন কল্পনা করেনি। কিন্তু ভাগ্যবিড়ম্বণায় অনাকাঙ্ক্ষিত বিভ্রান্তিতে সদ্য পুলকে বিকশিত মনভোমরা ওর মুমূর্ষ্য হয়ে পড়লেও সেদিন নিজের ভাগ্যকে কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি নির্মলা। পারেনি, সদ্য বিবাহিত সুঠাম সুদর্শণ তরুণ যুবক সৌরভকে সর্বান্তকরণে স্বামীরূপে গ্রহণ করতে, ওকে স্বীকার করতে! পারেনি, ওর হৃদয় নামক বিলাশ সাম্রাজ্যের রাজ সিংহাসনে বসাতে।

অতঃপর, বেনারসী শাড়ি, দামী স্বর্ণালঙ্কার ও সুরভীত ফুলের গহনায় সুসজ্জিত বধূ বেশে ধূর্ত স্বামীর প্রতিক্ষায় রাজরানীর মতো বসে থাকার আর প্রবৃত্তি হলো না নির্মলার। তিক্ত-বিষাক্ত হয়ে উঠল ওর দেহ, মন-মানসিকতা। জীবনের চরম মুহূর্তে কি না এতবড় প্রতারণা! এতবড় বিশ্বাসঘাতকতা!

সৌভাগ্যক্রমে বাসরঘরের সংলগ্নেই ছিল একটি বিশাল দরজা। পালাবার সুবর্ণ সুযোগ। এইভেবে বিছানা ছেড়ে নির্মলা দ্রুত নেমে আসে। গিয়ে দাঁড়ায় জানালার ধারে। গলা টেনে দেখল, দরজাটা খুললেই একটি ছোট্ট ব্যাল্কনি। ব্যাল্কনির চারিদিকে কোমড় পর্যন্ত পাতলা নেট্ দিয়ে ঘেরা। মাটি থেকে উচ্চতাও খুব বেশী নয়। অনায়াসে বেরিয়ে যাওয়া যাবে।

ইতিমধ্যেই দরজার আওয়াজ শুনে চমকে ওঠে নির্মলা। চোখ পাকিয়ে দ্যাখে, খাদির পাঞ্জাবি পড়ে নব বিবাহিত স্বামী সৌরভ ঘরের ভিতর ঢুকেই ছিটকিনি তুলে দরজাটা বন্ধ করে দিলো। আতরমাখা পাঞ্জাবীর পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করতেই দৃষ্টি আকর্ষণ করলো নির্মলার দিকে। মৃদুস্বরে বলল,-'তুমি ওখানে কেন নির্মলা! জানালার ধারে কি করছো!'

ততক্ষণে প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে অগ্নিসংযোগ করেই সুপ্রসন্ন মেজাজে একটা টান দিয়ে বলে,-'বাবা-মায়ের জন্যে মন কেমন করছে, তাই না! প্রথম প্রথম সব মেয়েরই এমন হয়। অন্তত আজকের দিনে মন খারাপ কোরো না, প্লীজ!'

কিছুক্ষণ থেমে বলল,-'কি হলো নির্মলা! কথা বলছ না যে! এসো, আমার কাছে এসো! কিছু বলো!'

সুসজ্জিত বিছানার পাশে রাখা টেবিল-ল্যাম্পটা তীব্র আলোয় জ্বলছিল। ল্যাম্পটার পাওয়ার সামান্য কমিয়ে দিয়ে নির্মলার অতি সন্নিকটে এগিয়ে আসে। নির্মলা তখনও পাথরের মতো শক্ত হয়ে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে। ভিতরে ভিতরে ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে ফেটে পড়ে। হুবহু একই চেহারা। একই হাইট। একই শরীরের গঠন। বোঝার উপায় নেই। খুশীর প্লাবনে হৃদয়ের দুকূল যেন ভেসে যাচ্ছে সৌরভের। স্বতঃফূর্তিতে মন-প্রাণ একেবারে টগবগ করছে। চোখমুখ থেকেও ঝরে পড়ছে আবেগ, উচ্ছ্বাস!

আশ্চর্য্য, স্পর্ধার বলিহারি! এতবড় একখানা ঘটনা ঘটে যাবার পরও কোনো প্রতিক্রিয়াই নেই, কোনো সংকোচবোধ নেই! ভেবেছে কি! দুনিয়ার মানুষকে ধোকা দিলেও নির্মলাকে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয় বাছাধন! ধীরেন মুখুজ্যের মেয়ে আমি, এতবড় অন্যায়, অধর্ম কখনোই সইবনা। এ বিয়ে আমি মানি না, আমি বিশ্বাস করি না। এগুলি বেআইনি, বেইমানী, ফ্রড! তুমি কতখানি এগোতে পারো, আজ আমিও দেখে নেবো!

নিরুত্তর নির্মলা। মনে মনে বাসররাতেই নব দাম্পত্য জীবনের যবানিকা ঘটাতে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ সৌরভের মৃদু কণ্ঠস্বরে কেঁপে ওঠে। -'কই, দেখি তোমার হাতটা!'
বলে পাঞ্জাবীর পকেট থেকে একটা ছোট্ট রেডবক্স বের করতেই থমকে দাঁড়ায় সৌরভ। -'উফ্, মাথাটা ভীষণ যন্ত্রণা করছে। একটা এ্যাস্পিপ্রন হবে?' বলতে বলতে জালানায় হেলান দিয়ে দাঁড়ায় নির্মলা।

ক্ষণিকের যে অকপট সারল্য দেখা গিয়েছিল, তা মুহূর্তেই মিলিয়ে গেল অপ্রস্তুত সৌরভের। মুখখানা ওর কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। একটা ঢোক গিলে বলল,-'তোমার শাড়ি গহনার ভরেই বোধহয়! দীজ্ আর টু হেভী! খুলে ফ্যালো সব! আমি এখনই এ্যাস্পিপ্রন এনে দিচ্ছি।'
বলে সৌরভ অবিলম্বে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ইত্যবসরে সুযোগের সদ্ ব্যবহার করতে সক্ষম হয় নির্মলা। পড়নের বেনারসি শাড়ি, গহনা সব খুলে একটা কাপড়ের পোটলায় বেঁধে, ব্যালকনি থেকে লাফ দিয়ে চুপিচুপি রাতের অন্ধকারে শ্বশুড়বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয় বান্ধবী সুদীপ্তার ফ্ল্যাটে। ততক্ষণে সারাপাড়ায় হৈ চৈ পড়ে যায়, বারুজ্যে বাড়ির নববধূ নিখোঁজ, সমস্ত গহনা স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে পালিয়েছে।

শুনে মাথায় হাত সবার। হতবাক হয়ে যায় বিস্ময়ে। এতবড় একটা ঘটনা ঘটলো কেমন করে? কিন্তু শ্বশুড়বাড়ির লোকেরা মনে মনে আশঙ্কা নিয়ে থাকলেও এমন একটা অশোভনীয় ঘটনা বাসররাতেই যে ঘটে যাবে, তা কেউই কল্পনা করতে পারেনি। ওদিকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় মাতা-পিতার শোচনীয় অবস্থা। মাথায় বজ্রাঘাত পড়ে। উক্ত ঘটনার কারণ অনুসন্ধ্যানে দিশা হারিয়ে ফেলে। লজ্জায় অপমানে জর্জরিত হয়ে বুক চাপড়াতে থাকে। কিছুতেই ভেবে কূল পায়না যে, নির্মলার আগ্রহেই এ বিবাহের আয়োজন। কোনদিকে ত্রুটি রাখেনি, এতটুকু কার্পণ্যতা করেনি। ওর সকল চাহিদা যথাযথ পরিপূর্ণ করেও মাতা-পিতার মুখে চূণকালি মেখে, তাদের উঁচু মাথা হেট করে দিয়ে, ও' কেন এমন করলো?

প্রমিলা আর্তনাদ করে ওঠে,-'ওরে সর্বণাশী কলঙ্কিনী, এ তুই কি করলি? এ কি সর্বণাশ ডেকে আনলি তুই? এই দিন দেখার জন্যই কি তোকে বুকে বেঁধে মানুষ করেছিলাম! পোড়ামুখি, জন্মলগ্নেই তো নিজের জনমধাত্রী মাকে খেয়েছিস। ধংস করে দিয়েছিস ওর সুখের সংসার, ছাড়খার করে দিয়েছিস মাতা-পিতার জীবন! আর সেরাতেই হাসপাতাল থেকে তোকে তুলে নিয়ে এসেছিলাম কি এই জন্যে? তোর এতটুকু রুচীতে বাঁধলো না? বিবেকে দংশণ করলো না? মায়ের অভাব কখনই তোরে বুঝতে দেই নাই! আমাদের এতবড় শাস্তি কেন দিলি তুই? আমাদের নাক কান সবই যে কাটা গেল রে! কিছুই আর অবশিষ্ট রাখলি নে!'

অথচ বিপ্লবের লেখা চিঠিখানা হাতে না পড়লে ততক্ষণে গভীর ভালোবাসায় লিপ্ত হয়ে নিজেকে সৌরভের কাছে সঁপে দিতো। আবেগে সোহাগ করেই কেটে যেত কত প্রহর! হারিয়ে যেতো দুজনার একান্ত আকাঙ্ক্ষিত চাওয়া-পাওয়ার অথৈ সাগরে। অঙ্গে অঙ্গে উষ্ণ পরশে দু'টি কোমল হৃদয়-মন-প্রাণ সারাশরীর মিশে লীন হয়ে একাকার হয়ে যেতো। অচিরেই দুজন দুজনার নিঃসৃত ভালোবাসার অবগাহনে নিমজ্জিত হয়ে কামনা বাসনার উত্তাল অগ্নিকান্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে নারী-পুরুষের আদিম খেলার উন্মাদণায় দুজনেই মেতে উঠত। কোনদিনও টের পেত না। কিন্তু সৌরভের সাথে বিয়েটাও তো আর মিথ্যে নয়! সামাজিক ও পারিবারিক রীতি-নীতি ও ধর্মানুসারে অগ্নি সাক্ষী রেখে, ছত্রিশ কোটি দেবী-দেবতা সাক্ষী রেখে স্বামী-স্ত্রী রূপে চিহ্নিত হয়েছে দুজনে। তার চে'ও বড় কথা, লগ্নভ্রষ্ঠার হাত থেকে সৌরভই ওকে বাঁচিয়েছে। ওর মাতা-পিতার মান-সম্মান-ইজ্জত রক্ষা করেছে! ওর মতো

এমন মহান এবং ক্ষমতাশীল ব্যক্তি ক'জন আছে সংসারে! হাতের পাঁচটা আঙ্গুল যেমন সমান নয়, তেমনি পৃথিবীর সব পুরুষ মানুষ সমান নয়। তা'ছাড়া, সৌরভকে অপছন্দ হবার কোন হেতুই নেই! গায়ের রঙ সামান্য চাপা হলেও মুখাকৃতিতে একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সুদর্শণ সু-পুরুষই বটে! ওর পৌরুষে আভিজাত্যের প্রকাশ সর্বক্ষণ! তবু আপত্তিটা কিসের? কিন্তু বলাই সার! এতো বোঝানোর পরও নির্মলার বিরল সেন্টিমেন্টাল। অনমনীয় ওর জেদ। মন-মানসিকতার পরিবর্তন তো হোলই না, উল্টে মস্তিস্কটাই ওর বিগড়ে গেল। কথায় বলে,-"ধর্মের ঢোল বাতাসে নড়ে! সত্য কখনোই গোপন থাকে না।"

সত্যিই তাই! পাড়াপর্শীর কানাঘুষোয় নিজের পরিচয় সম্বন্ধ্যে অবগত হতেই মাতৃতূল্য নিজের মাসিকে বুঝতে ভুল করে। বেঁকে বসল নির্মলা। সারাদিন পাগলের মত প্রলাপ বকতে লাগল,-'এটাতো বিয়ে নয়! নির্মলার শ্রাদ্ধ করেছ তোমরা, ওর অন্তিম ক্রিয়া সম্পন্ন করেছ! একটা অনাথ মেয়ের ফুলের মত নিস্পাপ জীবনকে তোমরা নষ্ট করে দিয়েছ! কে দিব্যি দিয়েছিল তোমাদের! মরে গেলে যেতাম, কেন তোমরা আমায় নিয়ে এসেছিলে? মানুষ করেছিলে? চেয়েছিলে মহামানব হতে? পারবে না, কোনদিনও পারবে না! চাই না তোমাদের ভিক্ষের দয়া! এ বিয়ে আমি মানি না। জোর জবরদস্তি করতে চাইলে তোমরা আমার মরা মুখ দেখবে। আর আমার মৃত্যুর জন্যে একমাত্র তোমরাই দায়ী থাকবে।'

হৃদয়াকাশের কোণে খুশীর ঝিলিক দিয়ে উঠতেই নিভে গেল নির্মলার একান্ত ভালোবাসার প্রদীপখানি। নিভে গেল ওর আশার আলো। সংসারের প্রতি, নিজের জীবনের প্রতি, পালক মাতা-পিতার প্রতি নিরাসাক্ত নির্মলাকে বোঝার চেষ্টাই করলো না কেউ। ওর প্রতি স্নেহ-মমতা-ভালোবাসা কিছুই রইল না। ধীরে ধীরে মায়ের সাথে কথাবার্তা, মুখ দেখাদেখি সব গেল বন্ধ হয়ে। রয়ে গেল পরগাছার মতো। ওদিকে শ্বশুড়বাড়ির কোন সাড়া শব্দ নেই! কেটে যায় প্রায় মাস ছয়েক। একদিন হঠাৎ উকিলের নোটিশ আসে, নির্মলাকে জবানবন্দী দিতে হবে কোর্টে। যা কল্পনাই করেনি কেউ। কিন্তু একরোখা মেয়ে নির্মলা গ্রাহ্যই করল না। সমাজ স্বীকৃতি দিলেও অস্বীকার করল সৌরভকে। আর সেই সঙ্গে পিতা ধীরেন মুখুজ্জ্যের দীর্ঘদিনের তপস্যা এবং ইলেকশানে এম.পি হবার স্বপ্নও ভেঙ্গে চৌচির হয়ে গেল। যার দর্শণে শহরের মস্তান গোছের ছেলেরা কাবু হয়ে যেতো। মাথা হেট হয়ে থাকতো। মুখ তুলে কথা বলার সাহস হোত না। কচ্ছপের মতো নিজেদের গুটিয়ে রাখতো। এমন প্রভাশালী ব্যক্তি মান-মর্যাদা, আত্মসম্মান ধূলোয় মিশে যাবার ক্ষোভে, দুঃখে অপমানের যন্ত্রণায় অতিষ্ট হয়ে একদিন চুপিচুপি মৃত্যুকে বরণ করে নিলেন নির্মলার পালক পিতা ধীরেন মুখার্জ্জী। আর সেই শোকে জীবনের কামনা-বাসনা, ইচ্ছা-আবেগ-অনুভূতির গলা টিপে, সংসারের মায়া-মোহ বর্জন করে নির্মলা আশ্রয় নেয় এক অনাথ আশ্রমে। যেখানে তরতাজা প্রস্ফূটিত ফুলের মতো একটি জীবনকে এতিম বাচ্চাদের সেবায় উৎসর্গ করে দিয়েছিল।

যুথিকা বড়ুয়া : টরোন্টো প্রবাসী গল্পকার ও সঙ্গীত শিল্পী।

jbarua1126@gmail.com